بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৯ নভেম্বর, ২০২৪ মোতাবেক ২৯ নবুয়্যত, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হুদাইবিয়া সন্ধির ঘটনাবলি বর্ণনা করা হচ্ছে। এর বিশদ বিবরণ তুলে ধরব। এসময় সাহাবীদের নিরাপত্তার জন্য দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.) রাতের বেলা নিরাপত্তার জন্য তাঁর সাহাবীদের পাহারা দেবার নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। প্রতিদিন পাহারা দেওয়া হতো। তিনজন পালাক্রমে পাহারা দিতেন। যাদের মধ্যে হযরত অওস বিন খওলি (রা.), আব্বাদ বিন বিশর (রা.) এবং মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) ছিলেন। এক রাতে হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন, তখন কুরাইশরা মিকরায বিন হাফস এর নেতৃত্বে ৫০ (পঞ্চাশ) ব্যক্তিকে এই আদেশ দিয়ে প্রেরণ করে যে, তারা যেন মহানবী (সা.)-এর শিবিরের চারপাশে ঘুরে-ফিরে দেখে যে, তারা কোনো মুসলমানকে হত্যা করতে পারবে কি না অথবা অকস্মাৎ তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে কি না। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) তাদের আটক করে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে আসেন। মিকরায পালিয়ে যায় এবং তার সঙ্গীদেরকে সতর্ক করে। এতে মহানবী (সা.)-এর সেই কথা সত্য প্রমাণিত হয় যার উল্লেখ গত খুতবায় করা হয়েছিল যে, মিকরায একজন প্রতারক ব্যক্তি। এরও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.)-এর অনুমতিক্রমে মুসলমানদের মধ্যে থেকে কয়েক ব্যক্তি মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন যাদের মধ্যে কুরয বিন জাবের ফেহরী, আব্দুল্লাহ্ বিন সুহাইল, আব্দুল্লাহ্ বিন হুযাফা সাহমি, আবু রোম বিন উমায়ের, আবদারি, আ'ইয়াশ বিন আবি রাবিআ, হিশাম বিন আ'স, আবু হাতেব বিন আমর, উমায়ের বিন ওয়াহাব, হাতেব বিন আবি বালতা এবং আব্দুল্লাহ্ বিন উমাইয়া অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এরা হযরত উসমান (রা.)-র নিরাপত্তায় মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। আর এটিও বলা হয়ে থাকে যে, তারা গোপনে প্রবেশ করেছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। কুরাইশরা মুসলমানদের সংবাদ পেয়ে তাদেরকে পাকড়াও করে। একইসাথে তারা তাদের সঙ্গীদের বন্দি হওয়ারও সংবাদ পায়, যাদেরকে হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) বন্দি করেছিলেন। যখন কুরাইশরা এই সংবাদ পায় যে, তাদের পঞ্চাশ ব্যক্তি মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়েছে, তখন কুরাইশদের অন্য একটি সশস্ত্র দল মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের দিকে আসে আর মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে বসে। তারা তির এবং পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে। মুশরিকদের ১২জন অশ্বারোহীকে মুসলমানরা বন্দি করে নেয় আর মুসলমানদের মধ্যে থেকে হযরত ইবনে যুনায়েম শহীদ হয়ে যান। কুরাইশরা তাকে তির নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিল।

এরপর কুরাইশরা একটি প্রতিনিধি দল মহানবী (সা.)-এর নিকট প্রেরণ করে যাদের মধ্যে সুহায়েল বিন আমরও ছিল। মহানবী (সা.) দূর থেকে তাকে দেখেই সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন, সুহায়েলের মাধ্যমে তোমাদের বিষয়টি সহজ হয়ে গেল। সুহায়েল মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছে বলে, আপনার সঙ্গী অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.) ও অন্য ১০জন

সাহাবীকে বন্দি করা এবং আমাদের কিছু লোকের আপনার সাথে লড়াই করার যে বিষয়টি রয়েছে, তাতে আমাদের কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি জড়িত নয়। আমরা যখন এ বিষয়ে অবগত হই তখন আমরা খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছি। এ ব্যাপারে আমরা কিছুই জানতাম না। এটি আমাদের জাতির বখাটে লোকদের কাজ ছিল। সুতরাং আপনি আমাদের যেসব লোককে দুই বারে বন্দি করেছেন তাদেরকে আমাদের কাছে ফেরত দিয়ে দিন। তিনি (সা.) বলেন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে ফেরত পাঠাব না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমার সঙ্গীদের না ছাড়বে। এতে তারা সবাই বলে, ঠিক আছে, আমরা তাদেরকে ছেড়ে দিচ্ছি। তখন কুরাইশরা হযরত উসমান (রা.) এবং অন্য দশজন সাহাবীকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। তখন মহানবী (সা.)ও তাদের লোকদের ছেড়ে দেন। যেমনটি এখনই উল্লেখ করা হয়েছে আর গত খুতবায়ও বলেছিলাম যে, কাফিররা হযরত উসমান (রা.)-কে আটক করেছিল আর এ সংবাদ যখন মহানবী (সা.)-এর নিকট পৌঁছে তখন তিনি (সা.) সাহাবীদের কাছ থেকে একটি বয়আতের অঙ্গীকার নেন বা বয়আত নেন, যেটিকে বয়আতে রিযওয়ান বলা হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, কুরাইশরা যখন হুদাইবিয়ার এই বয়আত সম্পর্কে অবগত হয় তখন তারা খুব ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তারাও জানতে পারে যে, এ বয়আত অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ মহানবী (সা.) সকল মুসলমানের কাছ থেকে একটি অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। তাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা পরামর্শ দেয়, সন্ধি করাই শ্রেয় হবে। অর্থাৎ এ মর্মে সন্ধি করা হোক, এটি বলা হোক যে, আপনারা এ বছর ফিরে যান এবং আগামী বছর এসে তিন দিন মক্কায় অবস্থান করতে পারবেন, কিন্তু আপনাদের সাথে কেবল একজন অশ্বারোহীর জন্য প্রয়োজনীয় আবশ্যক অস্ত্র, অর্থাৎ কোষবদ্ধ তরবারি এবং তির-ধনুক থাকবে, এছাড়া অন্য কিছু নয়। এ পরামর্শের পরে কুরাইশরা দ্বিতীয়বার সুহায়েল বিন আমরকে প্রেরণ করে। তার সাথে মিকরায বিন হাফস ও হুওয়াইতিব বিন আব্দিল উযযাও ছিল। তারা মহানবী (সা.)-এর নিকট এ প্রস্তাব নিয়ে আসে যে, এ বছর আপনারা উমরা না করেই ফিরে যান, যেন আরববাসী একথা বলতে না পারে, কুরাইশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনারা ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছেন; আর উমরা পালনের উদ্দেশ্যে আগামী বছর আসুন। অতএব সুহায়েল যখন সামনে এগিয়ে আসে তখন মহানবী (সা.) তাকে দূর থেকে লক্ষ্য করে বলেন, এ ব্যক্তিকে দ্বিতীয়বার প্রেরণের অর্থ হলো, কুরাইশ সন্ধি করার সংকল্প করেছে। হুদাইবিয়ার সন্ধির বিষয়টি হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এভাবে লিখেছেন,

সুহায়েল বিন আমর যখন মহানবী (সা.)-এর সামনে আসে তখন তাকে দেখামাত্রই তিনি (সা.) বলেন, এ হলো সুহায়েল। এখন আল্লাহ্ চাইলে বিষয়টি সহজ হয়ে যাবে। যাহোক, সুহায়েল আসতেই মহানবী (সা.)-কে বলে, আসুন, দীর্ঘ বিতর্ক ছাড়ুন। আমরা সন্ধি করতে প্রস্তুত। মহানবী (সা.) বলেন, আমরাও প্রস্তুত। একথা বলার পরপরই তিনি (সা.) তাঁর একান্ত সচিব অর্থাৎ হযরত আলী (রা.)-কে ডাকেন। যেহেতু সন্ধির শর্তাবলি নিয়ে একটি সাধারণ আলোচনা পূর্বেই হয়ে গিয়েছিল, পাশাপাশি বিস্তারিত নির্ধারিত হবার ছিল, তাই লিপিকার আসামাত্রই মহানবী (সা.) বলেন, [অর্থাৎ হযরত আলী (রা.)-কে বলেন,] লেখো! তিনি (সা.) স্বয়ং লেখাতে আরম্ভ করেন। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম (বাক্য) দিয়ে তিনি আরম্ভ করেন। সুহায়েল সন্ধি স্থাপনের জন্য প্রস্তুত ছিল বটে, কিন্তু কুরাইশের অধিকার সংরক্ষণ ও মক্কাবাসীদের মর্যাদা রক্ষার বিষয়েও সে খুব সচেতন ছিল। তৎক্ষণাৎ সে বলে ওঠে, **'রাহমান'**– এটি আবার কেমন শব্দ? আমরা তাঁকে চিনি না। আরবদের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী লেখো, অর্থাৎ **বিসমিকা আল্লাহুম্মা**। অর্থাৎ বিসমিল্লাহির রাহমানির

রাহীম নয়, বরং **বিসমিকা আল্লাহুম্মা** লেখো। অন্যদিকে মুসলমানদের জন্যও জাতীয় সম্মান ও ধর্মীয় আত্মাভিমানের বিষয় ছিল। তারাও (রা.) এ পরিবর্তনে তৎক্ষণাৎ সচকিত হয় আর বলে, আমরা তো অবশ্যই বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমই লিখব। কিন্তু মহানবী (সা.) একথা বলে মুসলমানদের শান্ত করেন যে, না, এতে কোনো অসুবিধা নেই; সুহায়েল যেভাবে বলে সেভাবেই লিখে নাও। অতএব **বিসমিকা আল্লাহুম্মা** লেখা হয়। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, লেখো, এই চুক্তি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) করেছেন। সুহায়েল পুনরায় এই বলে বাদ সাধে যে, এই রসূলুল্লাহ্ শব্দটি আমরা লিখতে দেবো না। আমরা যদি একথা মেনে নেই যে, আপনি আল্লাহ্‌র রসূল– তাহলে তো এই পুরো বিবাদেরই নিরসন হয়ে যায়; আপনাকে বাধা দেবার এবং আপনার সাথে লড়াই করার কোনো অধিকারই আমাদের থাকে না। অতএব আমাদের প্রথা অনুসারে কেবল এই শব্দাবলি লেখো যে, মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ এই চুক্তি করেছেন। মহানবী (সা.) বলেন, আপনারা মানুন বা না মানুন– আমি অবশ্যই খোদার রসূল; তবে যেহেতু আমি মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্‌ও বটে তাই ঠিক আছে, এভাবেই লিখে নাও। লেখো, মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ এই চুক্তি করছে। কিন্তু ইত্যবসরে তাঁর লিপিকার হযরত আলী (রা.) চুক্তির খসড়ায় মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) লিখে ফেলেছিলেন। তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে বলেন, **মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্** শব্দটি মুছে ফেলো আর সে-স্থানে **মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্** শব্দটি লিখে দাও। কিন্তু তখন (যেহেতু) উত্তেজনা বিরাজ করছিল, (তাই) হযরত আলী (রা.) আত্মাভিমানের কারণে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি আপনার নাম থেকে **রসূলুল্লাহ্** শব্দটি কখনো মুছবো না! হযরত মুহাম্মদ (সা.) তার এই হতবিহ্বল অবস্থা দেখে বলেন, আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যদি মুছতে না চাও তাহলে আমাকে দাও, আমি নিজেই মুছে দিচ্ছি। এরপর তিনি (সা.) চুক্তির কাগজ বা যা-ই ছিল তা নিজের হাতে নিয়ে হযরত আলী (রা.)-র কাছে সেই শব্দটি কোথায় আছে (তা) জিজ্ঞেস করে **রসূলুল্লাহ্** শব্দটি স্বহস্তে কেটে দেন এবং সেখানে ইবনে আব্দুল্লাহ্ শব্দ লিখে দেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এই বিষয়টি নিজের পুস্তকে এভাবে বর্ণনা করেছেন,

এরপর তিনি (সা.) লেখান, চুক্তিটি হলো, মক্কাবাসী আমাদেরকে বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ করতে বাধা দেবে না। সুহায়েল তৎক্ষণাৎ বলে, খোদার কসম! এবছর এটি কোনোভাবেই সম্ভব হবে না, নতুবা আরব সমাজে আমাদের নাক কাটা যাবে। তবে আগামী বছর আপনারা এসে তওয়াফ করতে পারবেন। তিনি (সা.) বলেন, ঠিক আছে, একথাই লেখো। এরপর সুহায়েল তার পক্ষ থেকে লেখায়, মক্কাবাসীদের মধ্য হতে কেউ গিয়ে মুসলমানদের সাথে যোগদান করতে পারবে না, এমনকি সে মুসলমান হলেও না। এমন কেউ যদি মুসলমানদের কাছে যায় তাহলে তাকে ফেরত পাঠানো হবে। একথা শুনে সাহাবীরা আর্তনাদ করে ওঠে, সুবহানাল্লাহ্! এটি কীভাবে হতে পারে যে, একজন ইসলাম গ্রহণ করে (আমাদের কাছে) আসবে আর আমরা তাকে ফেরত পাঠাব?

যাহোক, এই চুক্তি লেখা হচ্ছিল। এরই মধ্যে হঠাৎ করে হযরত **আবু জান্দাল বিন** সুহায়েল সেখানে আসেন। তার পা শিকলাবদ্ধ ছিল, তিনি মক্কা মুকাররমার নিম্নাঞ্চল থেকে রওয়ানা হয়ে নিজেকে মুসলমানদের সামনে উপস্থাপন করেন। (তার পিতা সুহায়েল– যে চুক্তি লেখাচ্ছিল– তিনি তার পুত্র ছিলেন এবং তিনি মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন।) তার পিতা সুহায়েল তাকে শিকলাবদ্ধ করে আটকে রেখেছিল এবং তিনি বন্দিশালা থেকে বের হয়ে পরিচিত রাস্তা বাদ দিয়ে পাহাড়ি পথ ধরে হুদাইবিয়ায় এসে যান। মুসলমানরা তাকে স্বাগত

জানাতে আরম্ভ করে এবং তাকে অভিনন্দন জানাতে থাকেন। **হযরত আবু জান্দাল**-এর পিতা সুহায়েল যখন তাকে দেখে তখন তার দিকে ঘুরে দাঁড়ায় আর কাঁটাযুক্ত ডাল দিয়ে তার মুখমণ্ডলে আঘাত করে এবং ঘাড় চেপে ধরে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! এটি প্রথম ঘটনা যে সম্পর্কে আমি আপনার সাথে চুক্তি করেছি। এখন আপনি একে ফেরত দিন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, এখনও চুক্তিনামা সম্পাদিত হয় নি। সুহায়েল বলে, আল্লাহ্‌র কসম! এমনটি হলে আমি কোনো বিষয়েই আপনার সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করব না। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, আপনি আমার খাতিরে একে ছেড়ে দিন। [মুহাম্মদ (সা.) সুপারিশ করেন, আমার খাতিরে একে ছেড়ে দাও।] সুহায়েল বলে, আমি কোনোভাবেই একে ছাড়বো না। মুহাম্মদ (সা.) পুনরায় তাকে বলেন, না! তুমি একে ছেড়ে দাও। সুহায়েল বলে, আমি কখনোই এটি করব না। তার সাথে থাকা **মিকরায বিন হাফস** এবং **হুওয়াইতিব বিন আব্দুল উযযা** বলে, আমরা আপনার খাতিরে একে ছেড়ে দিয়েছি। তারা উভয়ে হযরত আবু জান্দালকে ধরে একটি তাঁবুতে ঢুকিয়ে দেয় এবং তাকে (মুসলমানদের সাথে থাকার) অনুমতি দেয়, কিন্তু তার পিতা সুহায়েল (এটি মানতে) অস্বীকার করে। **হযরত আবু জান্দাল** (রা.) বলেন, হে মুসলমানেরা! আমাকে কি পৌত্তলিকদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে? অথচ আমি মুসলমান হয়ে (এখানে) এসেছি। তোমরা সেসব বিপদাপদ দেখো নি যার সম্মুখীন আমি হয়েছি, আর আমাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়। মহানবী (সা.) গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলেন, **হে আবু জান্দাল! ধৈর্য ধারণ করো এবং প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখো। নিঃসন্দেহে খোদা তা'লা তোমার জন্য এবং তোমার দুর্বল সাথিদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য ও মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে দেবেন। আমরা (এই) জাতির সাথে সন্ধিচুক্তি করেছি। আমরা তাদেরকে এবং তারা আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, আর আমরা প্রবঞ্চনা করি না।**

এ সময় হযরত উমর (রা.)-র উত্তেজিত হওয়ারও উল্লেখ পাওয়া যায়। লেখা আছে, মুসলমানরা এসব শর্ত অপছন্দ করেন আর ক্রোধান্বিত হন। সুহায়েল এসব শর্ত ব্যতীত সন্ধি করতে অস্বীকৃতি জানায়। যখন তারা সন্ধিতে সম্মতির পর কেবল লেখা বাকি ছিল, এমন সময় উমর বিন খাত্তাব (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে আসেন আর বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা কি সত্যের ওপরে (প্রতিষ্ঠিত) নই আর কাফিররা মিথ্যার ওপরে নয়? তিনি (সা.) বলেন, কেন নয়! তখন তিনি বলেন, আমাদের নিহতরা জান্নাতবাসী আর তাদের নিহতরা কি জাহান্নামী নয়? তিনি (সা.) বলেন, অবশ্যই! হযরত উমর (রা.) তখন বলেন, তাহলে আমরা হুদাইবিয়ার দিন যে সন্ধিচুক্তি করছি, তাতে আমাদের ধর্মের বিষয়ে এমন লাঞ্ছনাজনক কথা কেন সহ্য করব? আমরা কি এখান থেকে এমনিতেই ফিরে যাব, যতক্ষণ আল্লাহ্ তা'লা আমাদের আর তাদের মাঝে কোনো সিদ্ধান্ত প্রদান না করেন? (আমরা যুদ্ধ না করেই এবং অধিকার না নিয়েই কি ফিরে যাব?) মহানবী (সা.) বলেন, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রসূল। আমি তাঁর অবাধ্য হই না আর (তিনি) আমাকে আদৌ বিনষ্ট করবেন না। আর তিনিই আমার সাহায্যকারী। এরপর উমর বিন খাত্তাব (রা.) বলেন, আপনি কি আমাদের বলেন নি, আমরা অচিরেই বায়তুল্লাহ্ আসব এবং বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ করব? তিনি (সা.) বলেন, কেন নয়! (কিন্তু) আমি কি তোমাদের একথা বলেছিলাম যে, তোমরা এবছরই আসবে? হযরত উমর (রা.) বলেন, না । এরপর তিনি (সা.) বলেন, নিঃসন্দেহে তোমরা বায়তুল্লাহ্ আসবে আর এর তওয়াফ করবে।

এরপর হযরত উমর (রা.) রাগান্বিত অবস্থায় হযরত আবু বকর (রা.)-র কাছে যান, এবং অধৈর্য হয়ে যান। বলতে আরম্ভ করেন, হে আবু বকর! আল্লাহ্‌র এই রসূল কি সত্যের

ওপর প্রতিষ্ঠিত নন? হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, কেন নয়! হযরত উমর (রা.) বলেন, তারা কি মিথ্যার ওপর আর আমরা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নই? আমাদের নিহতরা কি জান্নাতে এবং তাদের নিহতরা জাহান্নামে যাবে না? হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, কেন নয়! তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, তাহলে আমরা আমাদের ধর্মের বিষয়ে কেন দুর্বলতা দেখিয়ে ফিরে যাব, অথচ খোদা তা'লা আমাদের এবং তাদের মাঝে এখনও মীমাংসা করেন নি? এরপর আবু বকর (রা.) বলেন, তিনি আল্লাহ্‌র রসূল আর তিনি নিজ প্রভুর অবাধ্যতা করেন না। আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে সাহায্য করবেন। তিনি হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, তুমি মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যে নিজেকে আমৃত্যু সম্পৃক্ত রেখো। খোদার কসম! তিনি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আরেকটি রেওয়ায়েত মতে বলেছেন, তিনি আল্লাহ্‌র রসূল। তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিঃসন্দেহে তিনি (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল। আরো বলেন, তিনি কি আমাদের বলেন নি, অচিরেই আমরা বায়তুল্লাহ্ আসব এবং এর তওয়াফ করব? হযরত আবু বকর (রা.) উত্তর দেন, কেন নয়! মহানবী (সা.) কি তোমাকে এই সংবাদ দিয়েছিলেন যে, এ বছরই তোমরা তওয়াফ করবে? হযরত উমর (রা.) বলেন, না। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তোমরা অবশ্যই বায়তুল্লাহ্ যাবে আর এর তওয়াফ করবে। যাহোক, এসব শর্ত হযরত উমর (রা.)-র জন্য খুবই অসহনীয় ছিল।

বুখারীতে উল্লেখ রয়েছে, হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র কসম! হুদাইবিয়ার দিন ব্যতিরেকে ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমি কখনো সন্দেহ করি নি, আর (সে-দিন আমি) মহানবী (সা.)-এর মুখের ওপর উত্তর দিতে থেকেছি। (অর্থাৎ আমি ইতঃপূর্বে তাঁর মুখের ওপর কোনো কথা বলি নি, কিন্তু সেদিন আমি তর্ক করতে থাকি।) হযরত আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহ্ (রা.) বলেন, হে ইবনে খাত্তাব! তুমি আল্লাহ্‌র রসূলের কথা কেন শুনছ না– যা তিনি বলছেন? তুমি শয়তানের হাত থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করো আর নিজের চিন্তাধারার সংশোধন করো।

হযরত উমর (রা.) বলেন, তারপর আমি আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয় চাইলাম। আমি এতটা লজ্জা কখনো অনুভব করি নি। আমি নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে শুরুতে যে বিলম্ব করেছিলাম সেই পাপ মোচনের জন্য এরপর আমি সৎকর্মও করতে থাকি। আমি আমার সে বাক্যালাপের কারণে যা হুদাইবিয়ার প্রান্তরে মহানবী (সা.)-এর সাথে করেছিলাম– সদকা করতে থাকি, রোযা রাখতে থাকি এবং ক্রীতদাস মুক্ত করতে থাকি; এমনকি আমার আশা জন্মায়, এবার মঙ্গল হবে। অর্থাৎ বুঝতে পারি যে, এবার আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা করবেন।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-ও এ ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেন,

একবার মহানবী (সা.) সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, আমি তোমাদেরকে অনেক নির্দেশ প্রদান করেছি কিন্তু তোমাদের নিষ্ঠাবান লোকদের মাঝেও কখনো কখনো আমি প্রতিবাদের মনমাসিকতা দেখতে পেয়েছি, অথচ আবু বকরের মাঝে আমি তা কখনো দেখি নি। হযরত আবু বকর (রা.)-র এই গুণ বর্ণনা করে বলেন, তিনি কখনো আমার কথা অমান্য করেন নি– তা সেটি পছন্দ হোক বা না হোক। অতএব হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, হুদাইবিয়া সন্ধির প্রাক্কালে হযরত উমর (রা.)-র মতো মানুষও বিচলিত হয়ে যান এবং তিনি বিচলিত অবস্থায় হযরত আবু বকর (রা.)-র কাছে গিয়ে বলেন, আমাদের সাথে কি খোদা তা'লার এ প্রতিশ্রুতি ছিল না, আমরা উমরা করব? তিনি (রা.) বলেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি ছিল। তিনি (রা.) বলেন, আমাদের সাথে কি আল্লাহ্ তা'লার এ প্রতিশ্রুতি ছিল না, তিনি আমাদের সাহায্য ও সমর্থন করবেন? হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হ্যাঁ ছিল।

তিনি (রা.) বলেন, তবে আমরা কি উমরা করেছি? হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে উমর! আল্লাহ্ তা'লা একথা বলেন নি, আমরা এ বছরই উমরা করব। অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, আমরা কি বিজয় ও সাহায্য লাভ করেছি? হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, বিজয় ও সাহায্য লাভের প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) আমাদের চেয়ে ভালো জানেন। কিন্তু হযরত উমর (রা.) এ উত্তরে আশ্বস্ত হতে পারেন নি আর তিনি এহেন বিচলিত ভাব নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সকাশে পৌঁছান এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা'লা কি আমাদের সাথে এ প্রতিশ্রুতি দেন নি, আমরা তাওয়াফরত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করব? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। তিনি (রা.) নিবেদন করেন, আমরা কি আল্লাহ্ তা'লার জামা'ত নই এবং আল্লাহ্ তা'লা কি আমাদের সাথে বিজয় ও সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন নি? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, করেছিলেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমরা কি তবে উমরা করেছি? তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা কবে বলেছিলেন, আমরা এ বছরই উমরা করব? এটি তো আমার ধারণা ছিল যে, এ বছর উমরা হবে। আল্লাহ্ তা'লা কোনোকিছু নির্দিষ্ট করেন নি। হযরত উমর (রা.) প্রশ্ন করতে গিয়ে বলেন, তাহলে বিজয় ও সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতির অর্থ কী? তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্র সাহায্য অবশ্যই আসবে আর তিনি যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন তা অবশ্যই পূর্ণ হবে। অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) যে উত্তর দিয়েছিলেন ঠিক একই উত্তর মহানবী (সা.) প্রদান করলেন।

হযরত উমরের মহানবী (সা.)-এর কাছে যাওয়া এবং নিজের আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো, পুনরায় হযরত আবু বকর (রা.)-র কাছে গিয়ে একই কথা বলার বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়েত পাওয়া যায়, কিন্তু ধারাবাহিকতা ভিন্ন ভিন্ন। এটি আমি পূর্বেও বর্ণনা করেছি এবং এখনো করলাম, সর্বোপরি ঘটনা একই। ক্রমবিন্যাস আগে-পিছে হওয়া এ ঘটনার সত্যতাকে কোনোভাবে প্রভাবিত করে না।

সন্ধির চুক্তিগুলো লেখার বিষয়ে সীরাত খাতামান নবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লেখেন,

যাহোক, বহু মতভেদের পর পরিশেষে এ সন্ধি হয়। আর মহানবী (সা.) প্রতিটি বিষয়ে নিজের মতামত বাদ দিয়ে কুরাইশদের দাবিদাওয়া মেনে নেন এবং ঐশী অভিপ্রায় অনুযায়ী নিজের এ অঙ্গীকারকে পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে পূর্ণ করেছেন যে, বায়তুল্লাহ্র সম্মান রক্ষার্থে কুরাইশের পক্ষ থেকে যে দাবিই উত্থাপিত হোক না কেন– তা মেনে নেওয়া হবে এবং সর্বাবস্থায় হারাম শরীফের সম্মান অটুট রাখা হবে। এ সন্ধিচুক্তির শর্তাবলি নিম্নে তুলে ধরা হলো,

প্রথমত, মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীরা এ বছর ফেরত চলে যাবেন।

দ্বিতীয়ত, পরবর্তী বছর মক্কায় এসে (তাঁরা) উমরাব্রত আদায় করতে পারবেন, কিন্তু খাপবদ্ধ তরবারি ছাড়া কোনো অস্ত্র সাথে আনতে পারবেন না। অধিকন্তু মক্কায় তিন দিনের বেশি অবস্থান করবেন না।

তৃতীয়ত, মক্কাবাসীদের মধ্যে যদি কোনো ব্যক্তি মদীনায় যায় তাহলে সে মুসলমান হলেও মহানবী (সা.) তাকে মদীনায় আশ্রয় দেবেন না, বরং ফিরিয়ে দেবেন। যেমন এ সম্পর্কে সহীহ বুখারীর বর্ণনা হলো,لا يأتيك منا رجل و ان كان على دينك الا رددته الينا অর্থাৎ আমাদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি আপনাদের কাছে চলে গেলেও আপনারা তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন, কিন্তু কোনো মুসলমান যদি মদীনা পরিত্যাগ করে মক্কায় আসে তাহলে তাকে

ফেরত পাঠানো হবে না। তারা নিজেদের এ দাবি মানিয়ে নিয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি মুসলমান হয়ে মদীনায় গেলে তাকে ফেরত পাঠাতে হবে, কিন্তু কোনো মুসলমান যদি মক্কায় আসে এবং ধরা পড়ে তাহলে তাকে ফেরত পাঠানো হবে না। এক বর্ণনায় রয়েছে, মক্কাবাসীদের মাঝে কোনো ব্যক্তি যদি তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মদীনায় আগমন করে তাহলে তাকে ফেরত পাঠানো হবে।

চতুর্থত, আরবের গোত্রগুলোর মাঝে কোনো গোত্র চাইলে মুসলমানদের মিত্র হতে পারে, আবার চাইলে মক্কাবাসীদের (মিত্র হতে পারে)।

পঞ্চম শর্ত ছিল, এ চুক্তি আপাতত দশ বছরের জন্য হবে আর এ সময় কুরাইশ এবং মুসলমানদের মাঝে যুদ্ধ স্থগিত থাকবে।

হুদাইবিয়া সন্ধির সাক্ষী সম্পর্কে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, এ সন্ধিপত্রের দুটি কপি তৈরি করা হয়েছিল আর সাক্ষী হিসেবে দুই পক্ষের অনেক সম্মানিত সদস্য এর ওপর স্বাক্ষর করেছিলেন। মুসলমানদের পক্ষ থেকে স্বাক্ষরকারীরা হলেন: হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান– যিনি ততক্ষণে মক্কা থেকে ফেরত চলে এসেছিলেন, আব্দুর রহমান বিন অওফ, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং আবু উবায়দা। চুক্তি সম্পাদিত হবার পর সুহায়েল বিন আমর চুক্তিপত্রের একটি কপি নিয়ে মক্কায় ফেরত যায় আর অন্য চুক্তিপত্রটি মহানবী (সা.)-এর কাছেই ছিল।

সাহাবীদের ব্যাকুলতার উল্লেখও পাওয়া যায় যেমনটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, চুক্তি লিপিবদ্ধ করার কাজ সম্পন্ন করে রসূলুল্লাহ্ (সা.) স্বীয় সাহাবীদের বলেন, ওঠো এবং তোমাদের উটগুলোকে জবাই করো; এরপর মাথা মুণ্ডন করো। কিন্তু তাদের একজনও উঠে দাঁড়ান নি, এমনকি তিনি এ কথাটি তিনবার বলেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এ ঘটনা বর্ণনা করে বলেন,

সুহায়েল যখন ফেরত যায় তখন মহানবী (সা.) সাহাবীদের বলেন, এখন ওঠো এবং এখানেই তোমাদের কুরবানীর পশুগুলোকে জবাই করে মাথা মুণ্ডন করো (কুরবানীর পর মাথার চুল মুণ্ডন বা ছাঁটা হয়;) এবং ফিরতি যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করো। কিন্তু এই বাহ্যত লাঞ্ছনাকর সন্ধিচুক্তির কারণে সাহাবীরা গভীর মর্মপীড়ায় জর্জরিত ছিলেন; এছাড়া তাদের দৃষ্টি যখন একথার প্রতি নিবদ্ধ হয় যে, মহানবী (সা.) আমাদেরকে একটি স্বপ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এখানে নিয়ে এসেছেন এবং আল্লাহ্ তা'লা স্বপ্নে বায়তুল্লাহ্ প্রদক্ষিণের দৃশ্যও দেখিয়েছেন, তখন সাহাবীরা একেবারে মুষড়ে পড়েন। আর তারা অনেকটা প্রাণহীন প্রাণীর ন্যায় নির্জীব ও অনুভূতিহীন অবস্থায় পড়ে ছিল। **খোদার রসূলের প্রতি তাদের পরিপূর্ণ ঈমান ছিল এবং তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রতিও পূর্ণ আস্থা ছিল, কিন্তু মানবপ্রকৃতির দাবি অনুসারে (তথা মানবপ্রকৃতির সীমাবদ্ধতার কারণে) তাদের হৃদয় এই সাময়িক ব্যর্থতার শোকে হতবিহ্বল ছিল। (এটি ছিল তাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া)। তাই মহানবী (সা.) যখন তাদেরকে বললেন যে, এখানেই কুরবানীর পশু জবাই করো; মক্কায় আমরা প্রবেশ করি বা না করি, কাবায় যাই বা না যাই, তাওয়াফ করি বা না করি– এখানেই বসা অবস্থায় কুরবানী করো আর ফিরে চলো, কোনো সাহাবী সামনে এগোন নি আর কেউ নিজ স্থান থেকে নড়েন নি। যারা কুরবানীর পশু নিয়ে এসেছিলেন সকলেই বসে থাকেন। এর কারণ এমনটি নয়, নাউযুবিল্লাহ্, তারা আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর অবাধ্য ছিলেন; কেননা পৃথিবীর মানচিত্রে সাহাবীদের ন্যায় এমন আনুগত্যকারী দল আর কখনো বিগত হয় নি। প্রকৃত অর্থে তাদের পক্ষ থেকে এই নির্দেশনা অমান্য করা কোনো বিদ্রোহ বা অবাধ্যতার কারণে ছিল না বরং দুঃখ এবং আপাত লাঞ্ছনার**

গ্লানি তাদেরকে এতটাই মুহ্যমান করে রেখেছিল যে, তারা শুনেও শুনছিল না আর দেখা সত্ত্বেও তাদের চোখ কাজ করছিল না। মহানবী (সা.) তাঁর এই নির্দেশ পুনঃপুন ব্যক্ত করেন কিন্তু কোনো সাহাবী অগ্রসর হন নি। মহানবী (সা.) এই ভেবে এতে ভীষণ কষ্ট পেলেন যে, আমার আদেশ কেউ মান্য করছে না। ফলে তিনি (সা.) চুপচাপ নিজ তাঁবুতে ফিরে গেলেন। তাঁবুর ভেতরে তাঁর (সা.) পবিত্র সহধর্মিণী হযরত উম্মে সালামা, যিনি সত্যিই এক বিচক্ষণ মহিলা ছিলেন, তিনি এই দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। তিনি তার সম্মানিত ও প্রিয় স্বামীকে চিন্তিত অবস্থায় তাঁবুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে দেখলেন আর তাঁর (সা.) মুখ থেকে তাঁর দুঃখ ও উদ্‌বেগের বিস্তারিত কারণ অবগত হয়ে ভালোবাসা ও সহানুভুতি প্রকাশার্থে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি দুঃখ করবেন না। আল্লাহ্‌র কৃপায় আপনার সাহাবীরা অবাধ্য নন। কিন্তু এই সন্ধিচুক্তি তাদেরকে দুঃখে উম্মাদপ্রায় করে দিয়েছে। অতএব আমার পরামর্শ হলো, তাদেরকে কিছুই বলার দরকার নেই; বরং আপনি চুপচাপ বাইরে গিয়ে নিজের কুরবানীর পশু জবাই করে দিন আর নিজ মাথা মুণ্ডন করে ফেলুন। দেখবেন, আপনার সাহাবীরা নিজেরাই আপনার অনুকরণ করবে। মহানবী (সা.) এই পরামর্শ পছন্দ করলেন এবং তিনি (সা.) বাইরে বেরিয়ে এসে কোনো কিছু না বলে নিজের কুরবানীর পশু জবাই করে নিজের মাথা মুণ্ডন করা শুরু করলেন। সাহাবীরা যখন এই দৃশ্য দেখলেন তখন যেভাবে এক ঘুমন্ত ব্যক্তি চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে হঠাৎ জাগ্রত হয় ঠিক সেভাবে তারা সম্বিত ফিরে পেলেন আর উম্মাদের ন্যায় নিজেদের পশু জবাই করা শুরু করে দিলেন আর একে অপরের মাথা মুণ্ডন করতে থাকলেন। কিন্তু দুঃখ তাদেরকে এতটাই উদ্বিগ্ন করে রেখেছিল যে, বর্ণনাকারী বলেন, সে সময় এমন পরিবেশ ছিল যে, ভয় হচ্ছিল, পাছে সাহাবীরা একে অপরের মাথা মুণ্ডন করতে গিয়ে একে অপরের গলা না কেটে ফেলে! মোটকথা, হযরত উম্মে সালামার পরামর্শ কার্যকর হয় এবং যেখানে মহানবী (সা.)-এর মুখনিঃসৃত বাণী সাময়িকভাবে বাহ্যত অকার্যকর মনে হচ্ছিল, সেখানে তাঁর (সা.) আমল ঘুমন্ত লোকদেরকে হঠাৎ জাগ্রত করে দেয়। এটিও সীরাত খাতামান নবীঈন পুস্তকের উদ্ধৃতি।

হুদাইবিয়ায় যখন মহানবী (সা.) নিজের কুরবানীর উট জবাই করলেন, তখন কুরবানীর পশুগুলোর মাঝে বদরের গণিমতের মাল হিসেবে প্রাপ্ত আবু জাহলের উট পালিয়ে যায়। এই উট চারণভূমিতে ছাড়া অবস্থান ছিল, সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। সেটির গলায় (কুরবানীর) মালা পরানো ছিল, কুরবানীর জন্য চিহ্নিত করা হয়েছিল, সাময়িকভাবে হারিয়ে যায়, কিন্তু পরে উদ্ধার করা হয়। মহানবী (সা.) সেটিকে সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানী করেন।

হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, (সেদিন) মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সত্তরটি পশু কুরবানী করেন। সাতজনের পক্ষ থেকে একটি পশু ছিল আর সেদিন আমরা ছিলাম সংখ্যায় চৌদ্দশজন। কুরবানীকারীদের তুলনায় কুরবানী করে নি এমন মানুষের সংখ্যা অধিক ছিল। অর্থাৎ তাদের সেই সামর্থ্য ছিল না। মহানবী (সা.) হেরেমের বাইরে অবস্থান করতেন কিন্তু হেরেমের ভিতর নামায আদায় করতেন। তিনি (সা.) আসলাম গোত্রের একজন ব্যক্তির হাতে নিজ কুরবানীর পশুর মধ্যে ২০টি পশু দিয়ে পাঠান যেন তিনি সেসব পশু মারওয়ার নিকটবর্তী স্থানে কুরবানী করেন। মহানবী (সা.) পশু কুরবানী শেষ করে তাঁবুতে ফিরে যান আর হযরত খিরাশ বিন উমাইয়্যাকে ডেকে নিজ মাথা মুণ্ডন করেন এবং নিজের চুলগুলো একটি কাঁটাযুক্ত সবুজ গাছের ওপর একপাশে ফেলে দেন। লোকেরা গাছের ওপর থেকে চুল নিয়ে নিজেদের মাঝে বণ্টন করে নেন। হযরত উম্মে আম্মারা তাঁর (সা.) কিছু চুল নিজের

জন্য নেন। তিনি সেসব চুল পানিতে ডুবিয়ে সেই পানি অসুস্থদের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে পান করাতেন। এর মাঝে এত বরকত ছিল যে, কোনো কোনো রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যেত। সাহাবীদের মধ্য থেকে কেউ কেউ একে অপরের মাথা মুণ্ডন করা শুরু করেন। আবার অনেকে চুল ছাঁটান। এদের মাঝে হযরত উসমান (রা.), হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত কাতাদা (রা.)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মহানবী (সা.) তাঁবু থেকে মাথা বের করে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা মাথা মুণ্ডনকারীদের প্রতি কৃপা করুন। তাঁর (সা.) নিকট নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহ্ রসূল (সা.)! আর যারা চুল ছাঁটিয়েছেন বা চুল কেটেছেন? তখন তিনি (সা.) তিনবার বলেন, আল্লাহ্ তা'লা মাথা মুণ্ডনকারীদের প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং চতুর্থ বার বলেন, আল্লাহ্ চুল ছাঁটাইকারীদের প্রতিও অনুগ্রহ করুন।

রেওয়ায়েতে আছে, মহানবী (সা.) হুদাইবিয়ায় ১৯ দিন পর্যন্ত অবস্থান করেন, মতান্তরে বিশ রাত সেখানে অবস্থান করেছিলেন। মুহাম্মদ বিন উমর, ওয়াকদী এবং ইবনে সা'দ একথা বলেছেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এবিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেছেন,

কুরবানী ইত্যাদি কাজ শেষে মহানবী (সা.) মদীনায় প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন। সেই সময় মহানবী (সা.) হুদাইবিয়া আগমনের কম-বেশি বিশ দিন গত হয়েছিল। তিনি (সা.) ফিরতি যাত্রায় যখন রাতের বেলা উসফানের নিকট কুরা'উল গামীমে পৌঁছেন তখন তিনি (সা.) ঘোষণা দিয়ে সাহাবীদের একত্রিত করেন এবং বলেন, আজ রাতে আমার ওপর একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে যেটি আমার নিকট দুনিয়ার সবকিছু থেকে অধিক প্রিয়। আর তা হলো,

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا . لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا . وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا (সূরা ফাতহ্:২-৪)

সূরা ফাতহ্ ২ থেকে ৪ নং আয়াত (পাঠ করা হয়েছে)। ২৮ নং আয়াতেও একই বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে।

لَّقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا (সূরা ফাতহ্: ২৮)

অর্থ: নিশ্চয় আমরা তোমাকে এক সুমহান বিজয় দান করেছি। যেন আল্লাহ্ তোমার (প্রতি আরোপিত) পূর্বের এবং ভবিষ্যতের যাবতীয় ভুলত্রুটি তোমাকে ক্ষমা করে দেন, তোমার ওপর তাঁর অনুগ্রহ চূড়ান্ত করেন, আর তোমার জন্য সাফল্যের সরলসুদৃঢ় পথ উন্মোচিত করতে পারেন। এবং আল্লাহ্ তোমাকে অবশ্যই অসাধারণ সাহায্যে ভূষিত করবেন।

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর রসূলের স্বপ্নটি পূর্ণ করেছেন যা তিনি তাঁর রসূলকে দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ চাইলে তোমরা অবশ্যই নিরাপদে 'মসজিদুল হারাম'-এ প্রবেশ করবে এবং আল্লাহ্র পথে পশু কুরবানী করে নিজেদের মাথা কামাবে বা চুল ছাঁটাবে এবং তোমাদের কোনো ভয়ভীতি থাকবে না।

অর্থাৎ যদি তোমরা এই বছর মক্কায় প্রবেশ করতে তাহলে এই প্রবেশ শান্তিপূর্ণ হতো না, বরং যুদ্ধ এবং রক্তপাতের মাধ্যমে প্রবেশ হতো। কিন্তু খোদা স্বপ্নে শান্তিপূর্ণ প্রবেশ দেখিয়েছিলেন। এজন্য খোদা এই বছর চুক্তির কল্যাণে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন।

এখন শীঘ্রই তোমরা খোদার দেখানো স্বপ্ন অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ অবস্থায় মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে। বাস্তবে এমনটিই হয়।

যখন তিনি (সা.) এই আয়াতগুলো সাহাবীদের শোনান, যেহেতু কিছু সাহাবীর মনে তখনও হুদাইবিয়ার সন্ধির তিক্ত রেশ রয়ে গিয়েছিল, তাই তারা বিস্মিত হন (ও বলেন), আমরা তো বাহ্যত বিফল হয়ে ফেরত আসছি, অথচ খোদা আমাদেরকে বিজয়ের সুসংবাদ দিচ্ছেন! এমনকি কিছু ত্বরাপরায়ণ সাহাবী এই ধরনের শব্দও বলে বসেন, এটা কি বিজয়? আমরা তো বায়তুল্লাহ্ তওয়াফে ব্যর্থ হয়ে ফেরত যাচ্ছি! মহানবী (সা.)-এর কানে এই কথাগুলো পৌঁছলে তিনি ভীষণ অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সংক্ষিপ্ত অথচ আবেগঘন বক্তৃতায় বলেন, এটা নিতান্তই বাজে আপত্তি! কেননা গভীরভাবে চিন্তা করলে প্রকৃতই হুদাইবিয়ার সন্ধি আমাদের জন্য এক মহান বিজয়। তিনি (সা.) বলেন, যে কুরাইশ আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ ছিল, তারা স্বয়ং যুদ্ধ পরিত্যাগ করে শান্তিচুক্তি করেছে। আর পরের বছর আমাদের জন্য মক্কার দরজা খুলে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে মক্কাবাসীদের বিশৃঙ্খলা থেকে নিরাপদ হয়ে ভবিষ্যৎ বিজয়ের সুসংবাদ পেয়ে ফেরত যাচ্ছি। অতএব, নিঃসন্দেহে এটি এক মহান বিজয়। তোমরা কি সেই দৃশ্য ভুলে গেছ, এই কুরাইশ উহুদ ও আহযাবের যুদ্ধে কীভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে চড়াও হয়েছিল? আর এই ভূপৃষ্ঠ বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল? তোমাদের চোখ ঠিকরে পড়ছিল এবং প্রাণ ওষ্ঠাগত ছিল? কিন্তু আজ সেই কুরাইশ তোমাদের সাথে শান্তি ও নিরাপত্তার চুক্তি করছে। সাহাবীরা নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা বুঝে গেছি। যতদূর পর্যন্ত আপনার দৃষ্টি পৌঁছেছে ততদূর আমাদের দৃষ্টি পৌঁছে না। কিন্তু এখন আমরা বুঝে গেছি, প্রকৃতই এই চুক্তি আমাদের জন্য এক মহান বিজয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, 'হুদাইবিয়ার ঘটনাকে খোদা তা'লা 'ফাতহে মুবীন' তথা সুস্পষ্ট বিজয় নামে অভিহিত করেছেন। আর বলেছেন, ইন্না ফাতাহনা লাকা ফাতহাম মুবীনা- সেই বিজয় অধিকাংশ সাহাবীর সামনেও অপ্রকাশিত ছিল, বরং কিছু মুনাফিকের মুরতাদ হবার কারণ হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটি সুস্পষ্ট বিজয় ছিল। যদিওবা এর প্রাথমিক পদক্ষেপগুলো ছিল তাত্ত্বিক আর গভীর।

আল্লামা বালাযুরী লেখেন, সন্ধিচুক্তির বহু উত্তম ও ইতিবাচক ফলাফল প্রকাশিত হয়। পরিশেষে মক্কা বিজয় হয়, সব মক্কাবাসী ইসলাম গ্রহণ করে, লোকেরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করে। এর কারণ হলো, এই সন্ধির পূর্বে লোকেরা পরস্পর সাক্ষাৎ করতে পারতো না, আর তাদের সামনে তাঁর (সা.) বিষয়টি সুস্পষ্ট ছিল না। তাদের কাছে এমন লোক আসতো না যারা তাঁর (সা.) অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে পারে। হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে লোকেরা পরস্পর সাক্ষাৎ করে। মুশরিকরা মদীনায় আসে, মুসলমানরা মক্কায় যায়। তারা নিজেদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের সাথে সাক্ষাৎ করে, তাদের কাছে মহানবী (সা.)-এর নির্দেশাবলি ও নিদর্শনাবলি সম্পর্কে জানতে পারে, নবুওয়্যতের বৈশিষ্ট্যগুলো জানতে পারে। তাঁর (সা.) উন্নত নৈতিক গুণাবলি ও সুন্দর জীবনাদর্শ সম্পর্কে অবহিত হয়। অনেক বিষয় স্বয়ং যাচাই করে। তাদের হৃদয় ঈমানের দিকে আকৃষ্ট হয়, এমনকি অনেক লোক ঈমান আনয়নের দিকে ধাবিত হয় এবং হুদাইবিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করে। অন্যরা ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হয়, এমনকি মক্কা বিজয়ের দিন সবাই ঈমান আনে। আরববাসী কুরাইশদের ইসলাম গ্রহণেরই অপেক্ষা করছিল। তাদের ঈমান আনয়নের পর পুরো আরব ঈমান আনয়ন করে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন,

মহানবী (সা.) যখন হুদাইবিয়ার সন্ধি করেন, এই সন্ধির কল্যাণমন্ডিত ফলাফলের মাঝে একটি ছিল, মানুষ তাঁর কাছে আসার সুযোগ লাভ করে এবং তারা মহানবী (সা.)-এর কথা শোনার সুযোগ পায় যার ফলে তাদের অধিকাংশই মুসলমান হয়ে যায়। যতদিন তারা মহানবী (সা.)-এর কথা শুনার সুযোগ পায় নি ততদিন তাদের ও মহানবী (সা.)-এর মাঝে একটি প্রাচীর ছিল, যা তাঁর (সা.) সৌন্দর্য সম্পর্কে তাদের অবহিত হবার পথে অন্তরায় ছিল। যেভাবে অন্যরাও তাঁকে (নাউযুবিল্লাহ্) মিথ্যাবাদী বলতো, তারাও বলতো। আর সেই কল্যাণ ও বরকত থেকে তারা বঞ্চিত ছিল যা তিনি (সা.) নিয়ে এসেছিলেন। কেননা তারা দূরে ছিল। কিন্তু যখন সেই পর্দা সরে গেলো আর কাছে এসে দেখল আর শুনল তখন সেই বঞ্চনা রইল না এবং সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

বাকি ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে বর্ণনা করা হবে।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)